পুনশ্চ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
1932

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

পুনশ্চ

প্রথম সংস্করণ, (১১০০) আশ্বিন, ১৩৩৯ সাল।
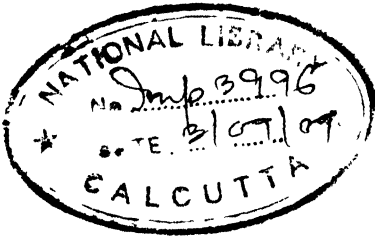
মূল্য—১৷৷০

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

নীতু

ভূমিকা

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েচে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেচি, "লিপিকা"র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি। আর একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েচি।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেচি। এর মধ্যে

কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্য-ছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেচি। যেমন "তরে" "সনে" "মোর" প্রভৃতি যে সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিইনি।

২ আশ্বিন, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

পুনশ্চ

কোপাই

পদ্মা কোথায় চলেচে বয়ে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক সে, কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত,—
অন্যপারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেকদিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠাল গাছ—
পুকুরের ধারে শর্ষে ক্ষেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিৎ,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিন রাত উঠ্‌চে মর্ম্মরধ্বনি।
ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা ক্ষেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদ-ওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্ম্মম নদীর ভয়ে কাঁপচে রাত্রিদিন।

পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়,
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
একদিকে নির্জ্জন পর্ব্বতের স্মৃতি, আর একদিকে নিঃসঙ্গ
সমুদ্রের আহ্বান।
একদিন ছিলেম ওরি চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেচি,
ঘুমিয়েচি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিনরাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখ দুঃখের পাশ দিয়ে অথচ দূর দিয়ে।

তার পরে যৌবনের শেষে এসেচি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য্য তার নামখানি
কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।

গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এপারের সঙ্গে ওপারের কথা চলে সহজে।
শনের ক্ষেতে ফুল ধরেচে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেচে কচি কচি ধানের চারা।
রাস্তা যেখানে থেমেচে তীরে এসে,
সেখানেও পথিককে দেয় পথ ছেড়ে—
কলকল স্ফটিক-স্বচ্ছ স্রোতের উপর দিয়ে।
অদূরে তালগাছ উঠেচে মাঠের মধ্যে,
তাকে বুঝি ডাকে, দাদাঠাকুর।
তীরে আম জাম আমলকির ঘেঁষাঘেঁষি,
কানাকানি করে তাদের সঙ্গে ভাই ভাই বলে।

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা,—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েচে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।
ছিপছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো,—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্ত্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,
ক্ষীণ হয় তার ধারা,
তলার বালি চোখে পড়ে,
তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।
তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন,
দুই তাকে দেয় শোভা ;
যেমন নটী যখন অলঙ্কারের ঝঙ্কার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে ;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁঠি আঁঠি খড় বোঝাই করে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

১ ভাদ্র, ১৩৩৯

নাটক

নাটক লিখেচি একটি।
বিষয়টা কী বলি।
অর্জ্জুন গিয়েচেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দন বনে।
উর্ব্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন বলে।
অর্জ্জুন বল্‌লেন, দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী,
অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা,
অনিন্দিত তোমার মাধুরী
প্রণতি করি আমি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে।

উর্ব্বশী বল্‌লেন, কোনো অভাব নেই দেবলোকের,
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর।
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে।
আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়।
মর্ত্ত্যকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রয়োজন মর্ত্ত্যের।

তাই এসেচি তোমার কাছে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে করো আমাকে বরণ,
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা,
মর্ত্ত্যের সেই অমৃত-অশ্রুর ধারা ॥

ভালো হয়েচে আমার লেখা।
ভালো হয়েচে, কথাটা কেটে দেব কি চিঠি থেকে।
কেন, দোষ হয়েচে কী।
সত্য কথাই বেরিয়েচে কলমের মুখে।
আশ্চর্য্য হয়েচ আমার অবিনয়ে,
বল্‌চ, ভালো যে হয়েইচে জান্‌লে কী করে।
আমার উত্তর এই, নিশ্চিত নাই বা জানলেম।
এককালের ভালোটা
হয়তো হবেনা অন্য কালের ভালো।
তাই তো এক নিঃশ্বাসে বল্‌তে পারি
ভালো হয়েচে।
চিরকালের সত্য নিয়ে কথা হোত যদি
চুপ করে থাকতেম ভয়ে।
কত লিখেচি কত দিন,
মনে মনে বলেচি, খুব ভালো।
আজ পরম শত্রুর নামে
পারতেম যদি সেগুলো চালাতে
খুসি হতেম তবে।
এ লেখারও একদিন হয়তো হবে সেই দশা,
সেই জন্যেই, দোহাই তোমার,
অসঙ্কোচে বল্‌তে দাও আজকের মতো
এ লেখা হয়েচে ভালো।

এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এলো।
হঠাৎ বর্ষণে চারদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেই রকমটা।
তবু ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে টলমল করে কলম চল্‌চে,
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।
তবু শেষ করব এ চিঠি,
কুয়াষার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে,
কল বন্ধ করে না।
বিষয়টা হচ্চে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফরমাস, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেচি গদ্যে।
পদ্য হোলো সমুদ্র,
সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এলো অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এলো
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল দোশালা
এলো জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন্ ঝঙ্কার লাগিয়ে দিল।
গর্জ্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিঃশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।

কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল ;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।
এ'কে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে,
আর চল্‌তিকালের চাঞ্চল্য।

৯ ভাদ্র, ১৩৩৯

নূতন কাল

আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল
সকাল বেলার প্রথম দোহন,
ভোরবেলাকার ব্যাপারীরা
চুকিয়ে দিয়ে গেল প্রথম কেনাবেচা,
তখন কাঁচারৌদ্রে বেরিয়েছি রাস্তায়,
ঝুড়ি হাতে হেঁকেছি আমার কাঁচা ফল নিয়ে,—
তাতে কিছু হয় তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরেনি।

তারপর প্রহরে প্রহরে ফিরেচি পথে পথে
কত লোক কত বল্‌লে, কত নিলে, কত ফিরিয়ে দিলে,
ভোগ করলে দাম দিলে না, সেও কত লোক,—
সেকালের দিন হোলো সারা।

কাল আপন পায়েব চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
একদিনের দায় টানি কেন আর একদিনের পরে,
দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই না কেন চলে সাম্‌নের দিকে চেয়ে।
সেদিনকার উদ্বৃত্ত নিয়ে নতুন কারবার জমবে না
তা নিলেম মেনে।
তাতে কী বা আসে যায়।
দিনের পর দিন পৃথিবীর বাসা ভাড়া
দিতে হয় নগদ মিটিয়ে।
তারপর শেষদিনে দখলের জোর জানিয়ে
তালা বন্ধ করবার ব্যর্থ প্রয়াস,
কেন সেই মূঢ়তা।

তাই প্রথম ঘণ্টা বাজল যেই
বেরিয়েছিলেম হিসেব চুকিয়ে দিয়ে।
দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই,
তখন দেখি তুমি যে আছ
একালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।
তোমার সঙ্গীরা একদিন যখন হেঁকে বল্‌বে
আর আমাকে নেই প্রয়োজন,

তখন ব্যথা লাগবে তোমারই মনে
এই আমার ছিল ভয়,
এই আমার ছিল আশা।
যাচাই করতে আসনি তুমি,—
তুমি দিলে গ্রন্থি বেঁধে তোমার কালে আমার কালে হৃদয় দিয়ে।
দেখলেম ঐ বড়ো বড়ো চোখের দিকে তাকিয়ে
করুণ প্রত্যাশা তো এখনো তার পাতায় আছে লেগে।

তাই ফিরে আসতে হোলো আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেচি সুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলঙ্কারে ;
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বল্‌তে পারো
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে।
দশজনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।
কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে।
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব
এই ইচ্ছা।

যেন গর্ব্ব করে বল্‌তে পারো
আমি তোমাদেরও বটে,

এই বেদনা মনে নিয়ে নেমেচি এই কালে,
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি, তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরোনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল ;
যেখানে পুরাতনের গান রয়েচে চিরন্তন হয়ে।
আর একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়াই,
যেখানে আজ আছে কাল নেই॥

১ ভাদ্র, ১৩৩৯

খোয়াই

পশ্চিমে বাগান বন চষা ক্ষেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগ্‌নি বাষ্পরেখায় ;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতাল পাড়া ;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘপথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।
হঠাৎ উঠেচে এক একটা যূথভ্রষ্ট তাল গাছ,
দিশাহারা অনির্দ্দিষ্টকে যেন দিক-দেখাবার ব্যাকুলতা।.
পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়,
তারি একধারে ছেদ পড়েচে উত্তরদিকে,
মাটি গেছে ক্ষয়ে,
দেখা দিয়েচে
উর্ম্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড় ;

মাঝে মাঝে মরুচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ডের মতো।
পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে রচনা করেচে
ছোট ছোট অখ্যাত খেলার পাহাড়,
বয়ে চলেচে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী।
শরৎকালে পশ্চিম আকাশে
সূর্য্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি,—
তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষীর উপরে
দেখেচি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েচে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্ব্বতের রক্তবর্ণ শিখর শ্রেণীতে,
রুষ্টরুদ্রের প্রলয় ভ্রূকুঞ্চনের মতো।
এই পথে ধেয়ে এসেচে কালবৈশাখীর ঝড়,
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে,
ঘোড়সওয়ার বর্গি সৈন্যের মতো,
কাঁপিয়ে দিয়েচে শাল সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েচে ঝাউয়ের মাথা,
হায় হায় রব তুলেচে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেচে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য,
ক্রন্দিত আকাশের নীচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েচে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিট্‌কে পড়চে তার শীকরবিন্দু।

এসেছিনু বালককালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে,
ঝির্ ঝির্ ঝর্‌নার ধারায়,
রচনা করেচি মন-গড়া রহস্য কথা,
খেলেচি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জ্জন দুপুরবেলায় আপনমনে একলা।

তারপরে অনেক দিন হোলো,
পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেচি একটা কাজের রূপ
ঐ আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেচি
নুড়ির দুর্গ।
এই শালবন, এই একলা-স্বভাবের তালগাছ,
ঐ সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি,
এর পানে অনেকদিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েচি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদলদিনে আর আমার বাদলগানে,
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।
আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথ রাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে—

তার পরে ?

তারপরে রইবে উত্তরদিকে

ঐ বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,

দক্ষিণ দিকে চাষের ক্ষেত,

পূবদিকের মাঠে চরবে গোরু।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে

গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।

পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে

আঁকা থাক্‌বে একটি নীলাঞ্জন রেখা॥

৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৯

পত্র

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা,

এক-বই-ভরা কবিতা।

তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল

একই সঙ্গে এক খাঁচায়।

কাজেই আর সমস্ত পাবে,

কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।

যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে

একদিন নাম্‌ল এসে কবিতা,—

সেইটেই পড়ে রইল পিছনে।

নিশীথ রাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে,
বিশ্ব-বেনের দোকানে
হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে,
তবু রসিকেরা বুঝতে পারে, যেন কম্‌তি হোলো কিসের।
যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ,
তোল করা যায় না তাকে,
কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।
মনে করো একটি গান উঠ্‌ল জেগে
নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে
একটি মাত্র নীলকান্ত মণি,—
তাকে কি দেখ্‌তে হবে
গয়নার বাক্সের মধ্যে।
বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েচেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয়নি লেপে কালি মাখিয়ে।
হাইড্রলিক জাঁতায়-পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-একগ্রাসে,
উপভোগটা পূরো অবসরে উঠত রসিয়ে।

হায়রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হোলো চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্ব্বাসন হোলো লাইব্রেরিলোকে ;

নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশরের হাটে হোলো নাকাল।
উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল-ডাঙার অম্নিবাস-এ চড়ে।
মন বলচে নিঃশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য—
আর আমি যদি হতেম—কী হবে বলে।
জন্মেচি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা,
কিনে পড় কবিতা
আরাম কেদারায় বসে।
চোখ বুজে কান পেতে শোনো না ;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাওনা বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচ শিকে দিয়েই খালাস॥

১০ ভাদ্র, ১৩৩৯

পুকুর ধারে

দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টলটল করচে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কল্‌মি শাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ ক-টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি ;
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেচে গরিবের মতো।
বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ওপারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান ;
আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলচে।
মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঁঠাতে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে।

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।

ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েচে,
টলমল করচে পুকুরের জল,
ঝিলমিল করচে বাতাবী-লেবুর পাতা।
চেয়ে দেখি আর মনে হয়
এ যেন আর কোনো একটা দিনের আবছায়া ;
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূর-কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
তার সাদা সাড়ির রাঙা-চওড়া পাড়
ছুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েচে ;
সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধূলো দেয় মুছিয়ে ;
সে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে সজ্‌নের ডালে,
ফিঙে ল্যাজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বল্‌তে পারে না ;
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে॥

২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৯

অপরাধী

তুমি বলো তিনু প্রশ্রয় পায় আমার কাছে—
তাই রাগ করো তুমি।
ওকে ভালোবাসি,
তাই ওকে তুষ্টু বলে দেখি,
দোষী বলে দেখিনে,—
রাগও করি ওর পরে
ভালোও লাগে ওকে,
এ কথাটা মিছে নয় হয়তো।
এক একজন মানুষ অমন থাকে
সে লোক নেহাৎ মন্দ নয়,
সেইজন্যেই সহজে তার মন্দটাই পড়ে ধরা।
সে হতভাগা রঙে মন্দ, কিন্তু মন্দ নয় রসে ;
তার দোষ স্তূপে বেশি
ভারে বেশি নয়,
তাই দেখতে যতটা লাগে,
গায়ে লাগে না তত।
মনটা ওর হাল্‌কা ছিপছিপে নৌকো,
হুহু করে চলে যায় ভেসে ;
ভালোই বলো আর মন্দই বলো
জম্‌তে দেয় না বেশিক্ষণ,—
এ পারের বোঝা ওপারে চালান করে দেয়
দেখতে দেখতে,—

ওকে কিছুই চাপ দেয় না,
তেমনি ও দেয়না চাপ।

স্বভাব ওর আসর-জমানো,
কথা কয় বিস্তর,
তাই বিস্তর মিছে বলতে হয়,—
নইলে ফাঁক পড়ে কথার ঠাস-বুনোনিতে।
মিছেটা নয় ওর মনে,
সে ওর ভাষায়।
ওর ব্যাকরণটা যার জানা
তার বুঝতে হয় না দেরি।
ওকে তুমি বলো নিন্দুক,—তা সত্য।
সত্যকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে দিয়ে ও নিন্দে বানায়,
যার নিন্দে করে তার মন্দ হবে বলে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে বলে।
তারা আছে সমস্ত সংসার জুড়ে।
তারা নিন্দের নীহারিকা,
ও হোলো নিন্দের তারা,
ওর জ্যোতি তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া।
আসল কথা ওর বুদ্ধি আছে নেই বিবেচনা।
তাই ওর অপরাধ নিয়ে হাসি চলে।
যারা ভালোমন্দ বিবেচনা করে সূক্ষ্ম তৌলের মাপে,
তাদের দেখে হাসি যায় বন্ধ হয়ে;
তাদের সঙ্গটা ওজনে হয় ভারী
সয় না বেশিক্ষণ;
দৈবে তাদের ত্রুটি যদি হয় অসাবধানে
হাঁপ ছেড়ে বাঁচে লোকে।

বুঝিয়ে বলি কাকে বলে অবিবেচনা ;—
মাখন লক্ষ্মীছাড়াটা সংস্কৃতর ক্লাশে
চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভূষো,—
ছাপ লেগেছিল পণ্ডিতমশায়ের জামার পিঠে,
সে হেসেছিল, সবাই হেসেছিল
পণ্ডিতমশায় ছাড়া।
হেড মাষ্টার দিলেন ছেলেটাকে একেবারে তাড়িয়ে,
তিনি অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি অত্যন্ত বিবেচক।
তাঁর ভাবগতিক দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যায়।

তিনু অপকার করে কিছু না ভেবে,
উপকার করে অনায়াসে,
কোনোটাই মনে রাখে না।
ও ধার নেয়, খেয়াল নেই শোধ করবার,
যারা ধার নেয় ওর কাছে
পাওনার তলব নেই তাদের দরজায়।
মোটের উপর ওরই লোকসান হয় বেশি।
তোমাকে আমি বলি, ওকে গাল দিয়ো যা খুসি
আবার হেসো মনে মনে,
নইলে ভুল হবে।
আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ বলে,
ভালো মন্দ পেরিয়ে।
তুমি দেখো দূরে বসে, বিশেষণের কাঠগড়ায় ওকে খাড়া রেখে।

আমি ওকে লাঞ্ছনা দিই তোমার চেয়ে বেশি—
ক্ষমা করি তোমার চেয়ে বড়ো করে।
সাজা দিই, নির্ব্বাসন দিইনে।
ও আমার কাছেই রয়ে গেল,
রাগ কোরো না তাই নিয়ে॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

ফাঁক

আমার বয়সে
মনকে বলবার সময় এলো,
কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি,
ধীরে সুস্থে চলো,
যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো সুরু
যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে মাঝে।
বয়স যখন অল্প ছিল
কর্ত্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুসির ব্রজধামে
ছিল বাল-গোপালের লীলা।
মথুরার পালা এল মাঝে.
কর্ত্তব্যের রাজাসনে।

আজ আমার মন ফিরেচে
সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে।
কী কী আছে দিনের দাবী
পাছে সেটা যাই এড়িয়ে
বন্ধু তার ফর্দ্দ রেখে যায় টেবিলে।
ফর্দ্দটাও দেখতে ভুলি,
টেবিলে এসেও বসা হয় না—
এমনিতরো ঢিলে অবস্থা।
গরম পড়েচে ফর্দ্দে এটা না ধরলেও
মনে আনতে বাধে না।
পাখা কোথায়,
কোথায় দার্জিলিঙের টাইমটেবিলটা,
এমনতরো হাঁপিয়ে ওঠবার ইসারা ছিল
থার্ম্মোমিটারে।
তবু ছিলেম স্থির হয়ে।

বেলা দুপুর
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করচে,
ধূ ধূ করচে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হুহু করে,
খেয়াল হয় না।
বনমালী ভাবে দরজা বন্ধ করাটা
ভদ্রঘরের কায়দা,—
দিই তাকে এক ধমক।
পশ্চিমের সাসির ভিতর দিয়ে
রোদ ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে।

বেলা যখন চারটে
বেহারা এসে খবর নেয়, চিট্‌ঠি !
হাত উল্‌টিয়ে বলি, নাঃ।
ক্ষণকালের জন্যে খটকা লাগে
চিঠি লেখা উচিত ছিল,—
ক্ষণকালটা যায় পেরিয়ে,
ডাকের সময় যায় তার পিছন পিছন।
এদিকে বাগানে পথের ধারে
টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো,
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেচে কুঞ্জ আমার।
কোকিল ডেকে ডেকে সারা,
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি
অত একান্ত জেদ কোরো না
বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।
মাঝে মাঝে ভোলো, মাঝে মাঝে ফাঁক,—
মনে রাখার মান-হানি কোরো না
তাকে দুঃসহ করে।
মনে আনবার অনেক দিন ক্ষণ আমারো আছে,
অনেক কথা, অনেক দুঃখ।
তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে ;
তারি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে

কাঁঠালতলার ঘন ছায়া
তপ্ত মাঠের ধারে
দূরের বাঁশি বাজায়
অশ্রুত মূলতানে।
তারি ফাঁকে ফাঁকে দেখি,
ছেলেটা ইস্কুল পালিয়ে খেলা করচে
হাঁসের বাচ্ছা বুকে চেপে ধরে,
পুকুরের ধারে,
ঘাটের উপর একলা বসে,
সমস্ত বিকেল বেলাটা।
তারি ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই
লিখ্‌চে চিঠি নূতন বধূ
ফেলচে ছিঁড়ে, লিখ্‌চে আবার।
একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে,
আবার একটুখানি নিঃশ্বাসও পড়ে॥

১১ ভাদ্র, ১৩৩৯

বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।

ওদের পাতা ঝরচে গাছের তলায়
উড়ে পড়চে আমার জান্‌লাতে।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পূবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রৌদ্দুর
তারি চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।
নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয় ;—
বাতাবি লেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে।
জারুল পলাশ মাদারে চলেচে রেশারেশি,
সজ্‌নে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়,
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

নদীতে নেমেচে ছোট একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।
তারি এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।
নদীর উপরে বেঁধেচি একটি সাঁকো,
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস,
আর ঢালুতটে চরে বেড়ায়

আমার পাটল রঙের গাই গোরুটি,
আর মিশোল রঙের বাছুর
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীলরঙের জাজিম পাতা,
খয়েরি রঙের ফুল-কাটা।
দেয়াল বাসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়।
একটুখানি বারান্দা পূবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্য্যোদয়ের আগেই।
একটি মানুষ পেয়েচি
তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
পাশের কুটীরে সে থাকে,
তার চালে উঠেচে ঝুম্‌কো-লতা।
আপন মনে সে গায় যখন
তখনি পাই শুন্‌তে,—
গাইতে বলিনে তাকে।
স্বামীটি তার লোক ভালো,
আমার লেখা ভালোবাসে—
ঠাট্টা করলে যথাস্থানে যথোচিত হাসতে জানে।—
খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে।
আবার হঠাৎ কোনো একদিন আলাপ করে
—লোকে যাকে চোখ-টিপে বলে কবিত্ব—

রাত্রি এগারোটার সময় শালবনে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

বাড়ির পিছন দিকটাতে
শাক-সব্‌জির ক্ষেত।
বিঘে দুয়েক জমিতে হয় ধান।
আর আছে আম কাঁঠালের বাগান
আস্‌শেওড়ার বেড়া-দেওয়া।
সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুন গুন গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,
তার স্বামী যায় দেখতে ক্ষেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে।
নদীর ওপারে রাস্তা,
রাস্তা ছাড়িয়ে ঘন বন,—
সেদিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি,
আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

এই পর্য্যন্ত।
এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনোদিন।—
ওর নামটা শুনিনে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন ঘন নীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।

আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ুরাক্ষী নদীর পারে ॥

৩ ভাদ্র, ১৩৩৯

দেখা

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জম্‌ল
ঘেঁষাঘেঁষি করে।
বাগানের দক্ষিণ সীমায় সেগুনগাছে
মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে হঠাৎ পড়ল আলো,
চম্‌কে উঠ্‌ল বনের ছায়া।
শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েচে
অনাহূত অতিথি,
হাসির কোলাহল উঠ্‌ল
গাছে গাছে, ডালে পালায়।
রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো

ভেসে ভেসে বেড়ালো মনের দূর গগনে।
বেলা গেল অকাজে ॥

বিকেলে হঠাৎ এল গুরু গুরু ধ্বনি,
কার যেন সঙ্কেত।
এক মুহূর্ত্তে মেঘের দল
বুক ফুলিয়ে হু হু করে ছুটে আসে
তাদের কোণ ছেড়ে।
বাঁধের জল হয়ে গেল কালো,
বটের তলায় নাম্‌ল থমথমে অন্ধকার।
দূর বনের পাতায় পাতায়
বেজে ওঠে ধারা-পতনের ভূমিকা।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘনবৃষ্টিতে পাণ্ডুর হয়ে আসে
সমস্ত আকাশ,
মাঠ ভেসে যায় জলে।
বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আলুথালু মাতামাতি করে
ছেলেমানুষের মতো,
ধৈর্য্য থাকে না তালের পাতায় বাঁশের ডালে।
একটু পরেই পালা হোলো শেষ
আকাশ নিকিয়ে গেল কে।
কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগশয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

মন বলে, এই আমার যত দেখার টুক্‌রো
চাইনে হারাতে।

আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চল্‌তি মুহূর্ত্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির কারু-কাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য্য কথাটি
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব কিছু॥

৪ ভাদ্র, ১৩৩৯

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসচে মাঠের উপর।
হুহু করে বইচে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেচে,
উত্তরের মাঠে নিম গাছে বেধেচে বিদ্রোহ,
তাল গাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝলমলে মধ্যাহ্ন

উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে
জুড়ে বসেচে আমার সমস্ত মন।
জানিনে কেন মনে হয়
এই দিন দূর কালের আর-কোনো একটা দিনের মতো।
এ রকম দিন মানে না কোনো দায়কে,
এর কাছে কিছুই নেই জরুরী,
বর্ত্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
একে দেখচি যে-অতীতের মরীচিকা বলে
সে অতীত কি ছিল কোনোকালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।
প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা,
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।
তেম্নি এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন,
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশ-বীণায় গৌড়-সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসচে সর্ব্বকালের নেপথ্য থেকে॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

শেষ দান

ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ।
শুক্‌নো ধূলো, একটি ঘাস উঠ্‌তে পায় না।
একধারে আছে কাঞ্চন গাছ,
আপন রঙের মিল পায় না সে কোথাও।
দেখে মনে পড়ে আমাদের কালো রিট্রিভার কুকুরটা,
সে বাঁধা থাকে কোঠাবাড়ির বারান্দায়।
দূরে রান্নাঘরের চারধারে উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহে
ঘুরে বেড়ায় দিশী কুকুরগুলো।
ঝগড়া করে, মার খায়, আর্ত্তনাদ করে,
তবু আছে সুখে নিজেদের স্বভাবে।
আমাদের টেডি থেকে থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে চঞ্চল হয়ে,
সমস্ত গা তার কাঁপতে থাকে,
ব্যগ্র চোখে চেয়ে দেখে দক্ষিণের দিকে,
ছুটে যেতে চায় ওদের মাঝখানে,
ঘেউ ঘেউ ডাকতে থাকে ব্যর্থ আগ্রহে।

তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়,
মানুষের পায়ে-দলা গরীব ধুলোর পরে।
চেয়ে থাকে দূরের দিকে,
ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা।

সেবার বসন্ত এল।
কে জান্‌বে, হাওয়ার থেকে
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।
অদূরে শালবন আকাশে মাথা তুলে
মঞ্জরী-ভরা সঙ্কেত জানালে
দক্ষিণ সাগর-তীরের নবীন আগন্তুককে।
সেই উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে
কোন্ চরম দিনের অদৃশ্য দূত দিল ওর দ্বারে নাড়া,
কানে কানে গেল খবর দিয়ে
একদিন নামে শেষ আলো,
নেচে যায় কচি পাতার শেষ ছেলেখেলার আসরে।

দেরি করলে না।
তার হাসিমুখের বেদনা
ফুটে উঠ্‌ল ভারে ভারে
ফিকে বেগ্‌নি ফুলে।
পাতা গেল না দেখা,
যতই ঝরে, ততই ফোটে,
হাতে রাখ্‌ল না কিছুই।
তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় করে।
তার পরে বিদায় নিল
এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে॥

৫ ভাদ্র, ১৩৩৯

কোমল গান্ধার

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,
বলত হেসে, মানে কী।
মানে একটু যায় না বোঝা, সেই মানেটাই খাঁটি।
কাজ আছে কর্ম্ম আছে সংসারে,
ভালো মন্দ অনেক কিছুই আছে,—
তাই নিয়ে তার মোটামুটি সবার সঙ্গে চেনা শোনা।
পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে
কেমন একটি সুর দিয়েচে চারদিকে।
আপনাকে ও আপনি জানে না।—
যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা,
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েচে কোন্ ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।
গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপ্‌সা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ঐ সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না।
চলায় বলায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান—
কেন যে তার পাইনে কিনারা।

তাই তো আমি নাম দিয়েচি কোমল-গান্ধার,—
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে—
বুকের মধ্যে অমন করে
কেন লাগায় চোখের জলের মীড় ॥

১৩ ভাদ্র, ১৩৩৯

বিচ্ছেদ

আজ এই বাদলার দিন,
এ মেঘদূতের দিন নয়।
এ দিন অচলতায় বাঁধা।
মেঘ চল্‌চে না, চল্‌চে না হাওয়া,
টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।
সময়ে যেন স্রোত নেই,
চারদিকে অবারিত আকাশ,
অচঞ্চল অবসর।

যেদিন মেঘদূত লিখেচেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্চে নীল পাহাড়ের গায়ে।

দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেচে মেঘ,
পূবে হাওয়া বয়েচে শ্যামজম্বু-বনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষনারী বলে উঠেচে
মাগো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।
মেঘদূতে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার পরে,
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েচে জয়ী।
সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝর্‌নায়, উদ্বেল নদীস্রোতে,
মুখরিত বন-হিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেচে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।
একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়েছিল
নিভৃত বাসককক্ষের বাইরে।
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরলো
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হোলো শেষ।

সেখানে অচল ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।

অপূর্ণ যখন চলেচে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করচে স্থির হয়ে ;
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেচে কাঁটা মাড়িয়ে।

ভুল বলা হল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলচে একই তালে।
তাই নদী চলেচে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলচে আহ্বানের সুরে॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

স্মৃতি

পশ্চিমে সহর।
তারি দূর কিনারায় নির্জ্জনে
দিনের তাপ আগ্‌লে আছে একটা অনাদৃত বাড়ি,
চারিদিকে চাল পড়েচে ঝুঁকে।

ঘরগুলোর মধ্যে চিরকালের ছায়া উপুড় হয়ে পড়ে',
আর চিরবন্দী পুরাতনের একটা গন্ধ।
মেঝের উপর হল্‌দে জাজিম,
ধারে ধারে ছাপ-দেওয়া বন্দুকধারী বাঘ-মারা শিকারীর মূর্ত্তি।
উত্তরদিকে সিসুগাছের তলা দিয়ে
চলেচে সাদা মাটির রাস্তা, উড়চে ধূলো,
খর রৌদ্রের গায়ে হাল্কা উড়নির মতো।
সাম্‌নের চরে গম অড়র ফুটি তরমুজের ক্ষেত,
দূরে ঝক্‌মক্ করচে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুণ-টানা নৌকো
কালির আঁচড়ে আঁকা ছবি যেন।
বারান্দায় রূপোর কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙ্‌চে জাঁতায়,
গান গাইচে এক-ঘেয়ে সুরে,
গিরধারী দারোয়ান অনেকখন ধরে তার পাশে বসে আছে,
জানি না কিসের ওজরে।
বুড়ো নিমগাছের তলায় ইঁদারা,
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী,
তার কাকু-ধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ,
তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার ক্ষেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপ্‌সা গন্ধ আসচে আমের বোলের,
খবর আসচে মহা-নিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেচে মেলা।
অপরাহ্ণে সহর থেকে আসে একটি পরবাসী মেয়ে,
তাপে কৃশ পাণ্ডুবর্ণ বিষণ্ণ তার মুখ,
মৃদুস্বরে পড়িয়ে যায় বিদেশী কবির কবিতা।

নীলরঙের জীর্ণ চিকের ছায়া-মিশোনো অস্পষ্ট আলোয়
ভিজে খসখসের গন্ধের মধ্যে
প্রবেশ করে সাগর পারের মানব-হৃদয়ের ব্যথা।
আমার প্রথম যৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে
আপন ভাষা।
প্রজাপতি যেমন ঘুরে বেড়ায়
বিলিতি মৌসুমি ফুলের কেয়ারিতে
নানা বর্ণের ভিড়ে॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৯।

ছেলেটা

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক,—
পরের ঘরে মানুষ হয়েছে,
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে ;—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি,—
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে,
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকণ সবুজ।

ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভীর্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না,—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে ;—
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র,—
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেচে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,
দাঁড়কাক বসেচে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খ চিল,—
বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেচে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগ্‌লি তোলে।
বেলা দুপুর।
লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে,
তলায় পাতা ছড়িয়ে শ্যাওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে।
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা ?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে।

ছেলেটার খেয়াল গেল ঐখানে ডুব দিতে,
ঐ সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো।
কী আছে দেখিই না, সব তাতে এই তার লোভ।
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে—
চেঁচিয়ে উঠে খাবি খেয়ে তলিয়ে গেল কোথায়।
ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোরু,
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে,
তখন সে নিঃসাড়।
তারপরে অনেকদিন ধরে মনে পড়েচে
চোখে কী করে শর্ষেফুল দেখে,
আঁধার হয়ে আসে,
যে মাকে কচিবেলায় হারিয়েচে
তার ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায় মিলিয়ে।
ভারি মজা,
কী করে মরে সেই মস্ত কথাটা।
সাথীকে লোভ দেখিয়ে বলে,—
"একবার দেখ্‌না ডুবে, কোমরে দড়ি বেঁধে,
আবার তুলব টেনে।"
ভারী ইচ্ছা করে জানতে ওর কেমন লাগে।
সাথী রাজি হয় না,
ও রেগে বলে, "ভীতু, ভীতু, ভীতু কোথাকার।"

বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো।
মার খেয়েচে বিস্তর, জাম খেয়েচে আরো অনেক বেশি।

বাড়ির লোকে বলে, লজ্জা করে না বাঁদর ?
কেন লজ্জা ?
বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়,—
গাছের ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দলে',
লজ্জা করে না ?

একদিন পাকড়াশিদের মেজোছেলে একটা কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে
ওকে বল্‌লে, দেখ্‌না ভিতর বাগে।
দেখল নানারঙ সাজানো,
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে।
বল্‌লে, "দে না ভাই, আমাকে।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক,
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা করে,
আর দেব আমের কষির বাঁশি॥"
দিল না ওকে।
কাজেই চুরি করে আন্‌তে হোলো।
ওর লোভ নেই,
ও কিছু রাখতে চায় না, শুধু দেখতে চায়
কী আছে ভিতরে।
খোদন দাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বল্‌লে,
"চুরি করলি কেন।"
লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব করলে,
"ও কেন দিল না।"
যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের।

ভয় নেই ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে।
কোলা ব্যাঙ তুলে ধরে খপ করে,
বাগানে আছে খোঁটাপোঁতার এক গর্ত্ত,
তার মধ্যে সেটা পোষে,—
পোকামাকড় দেয় খেতে।
গুব্‌রে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে,
খেতে দেয় গোবরের গুটি,
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।
ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালী।
একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাষ্টারের ডেস্কে,—
ভাব্‌লে, দেখিই না, কী করে মাষ্টার মশায়।
ডেক্‌সো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা।

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীনজাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সব সময়ে
গতি ছিল না চুরি ছাড়া,
সেই অপকর্ম্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া।
আর সেই সঙ্গেই কোন্ কার্য্যকারণের যোগে
শাসনকর্ত্তাদের শসাক্ষেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হোতো না রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।

একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনোদিন জল বেরোয়নি যে ছেলের চোখে
দুদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো,
মুখে অন্ন জল রুচল না,
বক্সিদের বাগানে পেকেচে করমচা,
চুরি করতে উৎসাহ হোলো না।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগনে ছিল সাত বছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে এল এক ভাঙা হাঁড়ি।
হাঁড়ি-চাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।

গেরস্ত-ঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে দূর দূর করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানি।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাতবছর হোলো,
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাৎ।
ওরই মতো কালো কোলো,
নাকটা ঐ রকম চ্যাপটা।
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্মি এই গয়লানি মাসির পরে,
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রং লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে।
দেখি না কী হয়, তারই বিবিধ রকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানির স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ঐ ছেলেটারই।

অম্বিকে মাষ্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল—
"শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই.
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেচে।
এত বড়ো বাঁদর।"
আমি বল্‌লুম, "সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,
তাহলে গুব্‌রে পোকা এত স্পষ্ট হোত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেচি লিখতে,
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডি।"

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

সহযাত্রী

সুশ্রী নয় এমন লোকের অভাব নেই জগতে,—
এ মানুষটি তার চেয়েও বেশি, এ অদ্ভুত।
খাপছাড়া টাক সামনের মাথায়,
ফুরফুরে চুল কোথাও সাদা কোথাও কালো।
ছোটো ছোটো দুই চোখে নেই রোঁওয়া,
ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি।

যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,
সমস্ত মুখের সে বারো আনা অংশীদার।
কপালটা মস্ত,
তার উত্তর দিগন্তে নেই চুল, দক্ষিণ দিগন্তে নেই ভুরু।
দাড়ি গোঁফ কামানো মুখে
অনাবৃত হয়েচে বিধাতার শিল্পরচনার অবহেলা।

কোথায় অলক্ষ্যে পড়ে আছে আলপিন, টেবিলের কোণে,
তুলে নিয়ে সে বিঁধিয়ে রাখে জামায়,
তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হাসে জাহাজের মেয়েরা ;
পার্শেল-বাঁধা টুক্‌রো ফিতেটা সংগ্রহ করে মেঝের থেকে,
গুটিয়ে গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি ;
ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখে টেবিলে।
আহারে অত্যন্ত সাবধান,
পকেটে থাকে হজ্‌মি গুঁড়ো
খেতে বসেই সেটা খায় জলে মিশিয়ে,
খাওয়ার শেষে খায় হজ্‌মি বড়ি।

স্বল্পভাষী, কথা যায় বেধে,
যা বলে মনে হয় বোকার মতো।
ওর সঙ্গে যখন কেউ পলিটিক্স্‌ বলে
বুঝিয়ে বলে অনেক করে,—
ও থাকে চুপচাপ, কিছু বুঝল কি না বোঝা যায় না।

চলেচি এক সঙ্গে সাতদিন এক জাহাজে।
অকারণে সকলে বিরক্ত ওর পরে,
ওকে ব্যঙ্গ করে আঁকে ছবি,
হাসে তাই নিয়ে পরস্পর।
ওর নামে অত্যুক্তি বেড়ে চলেচে কেবলি,
ওকে দিনে দিনে মুখে মুখে রচনা করে তুলচে সবাই।
বিধির রচনায় ফাঁক থাকে,
থাকে কোথাও কোথাও অস্ফুটতা।
এরা ভরিয়ে তোলে এদের রচনা দৈনিক রাবিশ দিয়ে,
খাঁটি সত্যের মতো চেহারা হয়,
নিজেরা বিশ্বাস করে।
সবাই ঠিক করে রেখেচে ও দালাল,
কেউ বা বলে রবারের কুঠির মেঝো ম্যানেজার ;
বাজি রাখা চল্‌চে আন্দাজ নিয়ে।

সবাই ওকে এড়িয়ে চলে,
সেটা ওর সয়ে গেছে আগে থাক্‌তেই।
চুরোট খাওয়ার ঘরে জুয়ো খেলে যাত্রীরা,
ও তাদের এড়িয়ে চলে যায়,
তারা ওকে গাল দেয় মনে মনে,
বলে কৃপণ, বলে ছোটলোক।

ও মেশে চাটগাঁয়ের খালাসীদের সঙ্গে।
তারা কয় তাদের ভাষায়
ও বলে যায় কী ভাষা কে জানে,
বোধ করি ওলন্দাজি।

সকালে রবারের নল নিয়ে তারা ডেক ধোয়
ও তাদের মধ্যে গিয়ে লাফালাফি করে,
তারা হাসে।
ওদের মধ্যে ছিল এক অল্প বয়সের ছেলে,
শামলা রঙ, কালো চোখ, ঝাঁকড়া চুল,
ছিপ্‌ছিপে গড়ন,—
ও তাকে এনে দেয় আপেল, কমলালেবু,
তাকে দেখায় ছবির বই।
যাত্রীরা রাগ করে য়ুরোপের অসম্মানে।

জাহাজ এল শিঙাপুরে।
খালাসীদের ডেকে ও তাদের দিল সিগারেট,
আর দশটা করে টাকার নোট।
ছেলেটাকে দিলে একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি।
কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিয়ে
তড়বড় করে নেমে গেল ঘাটে।

তখন তার আসল নাম হয়ে গেল জানাজানি।
যারা চুরোট-ফোঁকার ঘরে তাস খেলত
হায় হায় করে উঠল তাদের মন॥

১ ভাদ্র, ১৩৩৯

———

বিশ্বশোক

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না।

অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি ;
মাথা তুলেচে দুর্দ্দর্শ সূর্য্যলোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।
আমার সে নয়,
সে অসংখ্যের।
বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
দোলে পতাকা মহাকাশে।

তার সমুখে লজ্জা দিয়ো না,—
আমার ক্ষতি, আমার ব্যথা
তাঁর সমুখে কণার কণা।

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।
দেখতে পাব বেদনাব বন্যা নামে কালের বুকে,
শাখা প্রশাখায় ;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠচে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে ;
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নাম্‌ল হঠাৎ আমার বুকে ;
এক প্লাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো,—
সব ধরণীর কান্নার গর্জ্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,—
কী উদ্দেশে কে তা জানে॥

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক্ তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে॥

১১ ভাদ্র, ১৩৩৯

শেষ চিঠি

মনে হচ্চে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন,
অপরাধ হয়েচে আমার
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।
ঘরে ঘরে বেড়াই ঘুরে,
আমার জায়গা নেই,—
হাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে আসি।
এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যাব দেরাদূনে।
অমলির ঘরে ঢুকতে পারিনি বহুদিন
মোচড় যেন দিত বুকে।

ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ করে—
তাই খুললেম ঘরের তালা।
এক জোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল, এসেন্সের শিশি
শেল্‌ফে তার পড়বার বই,
ছোটো হার্মোনিয়ম।
একটা এলবাম্‌,
ছবি কেটে কেটে জুড়েচে তার পাতায়।
আলনায় তোয়ালে জামা,
খদ্দরের শাড়ি।
ছোটো কাচের আলমারিতে
নানারকমের পুতুল,
শিশি, খালি পাউডারের কৌটো।
চুপ করে বসে রইলেম চৌকিতে
টেবিলের সামনে।
লাল চামড়ার বাক্স,
ইস্কুলে নিয়ে যেত সঙ্গে।
তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
আঁক কষবার খাতা।
ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি,
আমারি ঠিকানা লেখা,
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে।
শুনেচি ডুবে মরবার সময়
অতীতকালের সব ছবি
এক মুহূর্ত্তে দেখা দেয় নিবিড় হয়ে—

চিঠিখানি হাতে নিয়ে তেমনি পড়ল মনে
অনেক কথা এক নিমেষে।

অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাতবছর।
কেমন একটা ভয় লাগল মনে
ও বুঝি বাঁচবে না বেশিদিন।—
কেননা বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকাল বিচ্ছেদের ছায়া
ভাবী কাল থেকে উল্‌টে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।
সাহস হোতো না ওকে সঙ্গ-ছাড়া করি।
কাজ কর্‌চি আপিসে বসে
হঠাৎ হোত মনে
যদি কোনো আপদ ঘটে থাকে।

বাঁকিপুর থেকে মাসি এল ছুটিতে,—
বললে, মেয়েটার পড়াশুনো হোলো মাটি—
মুর্খু মেয়ের বোঝা বইবে কে
আজকালকার দিনে।
লজ্জা পেলেম কথা শুনে তার,
বল্লেম, কালই দেব ভর্ত্তি করে বেথুনে।

ইস্কুলে তো গেল,
কিন্তু ছুটির দিন বেড়ে যায় পড়ার দিনের চেয়ে।

কতদিন স্কুলের বাস্ অমনি যেত ফিরে।
সে চক্রান্তে বাপেরও ছিল যোগ।

ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে,
বল্‌লে, "এমন করে চল্‌বে না।
নিজে ওকে যাব নিয়ে,
বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে,—
ওকে বাঁচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে।
মাসির সঙ্গে গেল চলে।
অশ্রুহীন অভিমান
নিয়ে গেল বুক ভরে',
যেতে দিলেম ব'লে।

বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়,—
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে।
চার মাস খবর নেই।
মনে হোলো গ্রন্থি হয়েচে আল্‌গা
গুরুর কৃপায়।
মেয়েকে মনে মনে সঁপে দিলেম দেবতার হাতে,—
বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা।

চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেম অমলিকে দেখতে কাশিতে—
পথের মধ্যে পেলেম চিঠি,—
কী আর বলব,—
দেবতাই তাকে নিয়েচে।—

যাক্ সে সব কথা।
অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা,—
"তোমাকে দেখতে বড্ডো ইচ্ছে করচে।"
আর কিছুই নেই॥

৩১ শ্রাবণ, ১৩৩৯

বালক

হিরণ মাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে।
দুটি ঘড়া জল আনতে হয় দিঘি থেকে—
তার দিঘিটা ঐ দুই ঘড়ারই মাপে
রান্নাঘরের পিছনে বাঁধা দরকারের বাঁধনে।

এদিকে তার মা-মরা বোনপো,
গায়ে যে রাখে না কাপড়
মনে যে রাখে না সদুপদেশ,
প্রয়োজন যার নেই কোনো কিছুতেই,
সমস্ত দিঘির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা।
যখন খুসি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে,
মুখে জল নিয়ে আকাশে ছিটতে ছিটতে সাঁতার কাটে,

ছিনিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে,
কঞ্চি নিয়ে করে মাছ-ধরা খেলা,
ডাঙায় গাছে উঠে পাড়ে জামরুল,
খায় যত, ছড়ায় তার বেশি।
দশ-আনীর টাক-পড়া মোটা জমিদার,—
লোকে বলে দিঘির স্বত্ব তারই,
বেলা দশটায় সে চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে,
ঝপ্ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়,
বাঁশবনের তলা দিয়ে দুর্গা নাম করতে করতে চলে ঘরে,
সময় নেই, জরুরি মকর্দ্দমা।
দিঘিটা আছে তার দলিলে, নেই তার জগতে।
আর ছেলেটার দরকার নেই কিছুতেই,
তাই সমস্ত বন বাদাড় খাল বিল তারই,
নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির,
তেঁতুল গাছের সবার উঁচু ডালটা।
জাম বাগানের তলায় চরে ধোবাদের গাধা,
ছেলেটা তার পিঠে চড়ে,
ছড়ি হাতে জমায় ঘোড়দৌড়।
ধোবাদের গাধাটা আছে কাজের গরজে,
ছেলেটার নেই কোনো দরকার,
তাই জন্তুটা তার চার পা নিয়ে সমস্তটা তারই,
যাই বলুন না জজ সাহেব।
বাপ মা চায় পড়ে' শুনে' হবে সে সদর-আলা ;
সর্দ্দারপোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে,
হেঁচ্‌ড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে,
হাজির করে পাঠশালায়।

মাঠে ঘাটে হাটে বাটে জলে স্থলে তার স্বরাজ,
হঠাৎ দেহট্াকে ঘিরলে চার দেয়ালে,
মনটাকে আটা দিয়ে এঁটে দিলে
পুঁথির পাতার গায়ে।

আমিও ছিলেম একদিন ছেলেমানুষ।
আমার জন্যেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
অকর্ম্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ।
তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে
মিলল না আমার জায়গা।
আমার বাসা অনেক কালের পুরোনো বাড়ির
কোণের ঘরে;
বাইরে যাওয়া মানা।
সেখানে চাকর পান সাজে, দেয়ালে মোছে হাত,
গুন্ গুন্ করে গায় মধুকানের গান।
শান-বাঁধানো মেজে, খড়খড়ে দেওয়া জানলা।
নীচে ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেল গাছ।
জটাধারী বুড়ো বট মোটা মোটা শিকড়ে
আঁকড়ে ধরেচে পুব ধারটা।
সকাল থেকে নাইতে আসে পাড়ার লোকে,
বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকিমিকি জলে
ভেসে বেড়ায় পাতিহাঁসগুলো,
পাখা সাফ করে ঠোঁট দিয়ে মেজে।

প্রহরের পর কাটে প্রহর।
আকাশে ওড়ে চিল,

থালা বাজিয়ে যায় পুরোনো কাপড়-ওয়ালা,
বাঁধানো নালা দিয়ে গঙ্গার জল এসে পড়ে পুকুরে।
পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ
আমি সেখানে জন্মেচি গরীব হয়ে।
শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড়-জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ-পোহানো ছাদে।
অশোকবনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নব দুর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।
আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে'
সজল নবনীল মেঘে।
আন্‌ত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্ত্তা
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্ব্বাসিত।
ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু করে তার বুক উঠত দুলে।
বটগাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো।
নারকেল ডালের সবুজ হোত নিবিড়,
পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে।
যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল
সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে, বনে বনে।
পুবদিকের ওপার থেকে বিরাট এক ছেলেমানুষ
ছাড়া পেয়েচে আকাশে,
আমার সঙ্গে সে সাথী পাতালে।

বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম।
একে একে
পুকুরের পৈঁঠা যায় জলে ডুবে।
আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি।
রাত্তির হয়ে আসে, শুতে যাই বিছানায়,
খোলা জানলা দিয়ে গন্ধ পাই ভিজে জঙ্গলের।
উঠোনে এক হাঁটু জল,
ছাদের নালার মুখ থেকে জলে পড়চে জল মোটা ধারায়।
ভোর বেলায় ছুটেচি দক্ষিণের জানলায়,
পুকুর গেছে ভেসে;
জল বেরিয়ে চলেচে কলকল করে বাগানের উপর দিয়ে,
জলের উপর বেলগাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা জেগে থাকে।
পাড়ার লোকে হৈ হৈ করে এসেচে
গামছা দিয়ে ধুতির কোঁচা দিয়ে মাছ ধরতে।
কাল পর্য্যন্ত পুকুরটা ছিল আমারি মতো বাঁধা,
এ-বেলা ও-বেলা তার উপরে পড়ত গাছের ছায়া,
উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়া-তুলি,
বটের ডালের ভিতর দিয়ে, যেন সোনার পিচকারিতে,
ছিট্‌কে পড়ত তার উপরে আলো,
পুকুরটা চেয়ে থাকত আকাশে ছলছলে দৃষ্টিতে।
আজ তার ছুটি, কোথায় সে চল্‌ল ক্ষ্যাপা
গেরুয়া-পরা বাউল যেন।
পুকুরের কোণে নৌকোটি,
দাদারা চড়ে বসল ভাসিয়ে দিয়ে,
গেল পুকুর থেকে গলির মধ্যে
গলির থেকে সদর রাস্তায়,
তারপরে কোথায় জানিনে। বসে বসে ভাবি।

বেলা বাড়ে।

দিনান্তের ছায়া মেশে মেঘের ছায়ায়,

তার সঙ্গে মেশে পুকুরের জলে বটের ছায়ার কালিমা।

সন্ধ্যে হয়ে এল।

বাতি জ্বলল ঝাপসা আলোয় রাস্তার ধারে ধারে,

ঘরে জ্বলেচে কাঁচের সেজে মিট্‌মিটে শিখা,

ঘোর অন্ধকারে একটু একটু দেখা যায়

দুলচে নারকেলের ডাল,

ভূতের ইসারা যেন।

গলির পারে বড়ো বাড়িতে সব দরজা বন্ধ,

আলো মিট্‌মিট্ করে দুই একটা জানলা দিয়ে,

চেয়ে-থাকা ঘুমন্ত চোখের মতো।

তারপরে কখন আসে ঘুম,

রাত দুটোর সময় স্বরূপ সর্দ্দার নিস্তব্ধ রাতে

বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে।

বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেচে আমার মন ;

আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।

শালের পাতায় পাতায় কোলাহল,

তালের ডালে ডালে করতালি,

বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে,

ছাতিম গাছের থেকে মালতী লতা

ঝরিয়ে দেয় ফুল।

আর সেদিনকার আমারি মতো অনেক ছেলে আছে ঘরে ঘরে,

লাঠাইয়ের সুতোয় মাখাচ্চে আঠা,

তাদের মনের কথা তারাই জানে॥

২রা ভাদ্র ১৩৩৯

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

বাবা এসে শুধালেন
"কী করছিস স্থনি,
কাপড় কেন তুলিস বাক্সে, যাবি কোথায় ?"

স্থনৃতার ঘর তিনতলায়।
দক্ষিণ দিকে ছুই জানলা,
সামনে পালঙ্ক,
বিছানা লক্ষ্ণৌ ছিটে ঢাকা।
অন্য দেয়ালে লেখবার টেবিল,
তার কোণে মায়ের ফোটোগ্রাফ,
তিনি গেছেন মারা।
বাবার ছবি দেয়ালে,
ফ্রেমে জড়ানো ফুলের মালা।
মেঝেতে লাল সতরঞ্চে
সাড়ি শেমিজ ব্লাউজ,
মোজা রুমাল ছড়াছড়ি।
কুকুরটা কাছ ঘেঁষে ল্যাজ নাড়ছে,
ঠেলা দিচ্চে কোলে থাবা তুলে,
ভেবে পাচ্চে না কিসের আয়োজন,
ভয় হচ্চে পাছে ওকে ফেলে রেখে আবার যায় কোথাও।
ছোট বোন শমিতা বসে আছে হাঁটু উঁচু করে,
বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।

চুল বাঁধা হয়নি,
চোখ দুটি রাঙা, কান্নার অবসানে।

চুপ করে রইল সুনৃতা,
মুখ নীচু করে সে কাপড় গোছায়,
হাত কাঁপে।
বাবা আবার বল্‌লেন,
"সুনি কোথাও যাবি না কি।"
সুনৃতা শক্ত করে বল্‌লে, "তুমি তো বলেইচ,
এ বাড়িতে হতে পারবে না আমার বিয়ে,
আমি যাব অনুদের বাসায়।"
শমিতা বল্‌লে, "ছি ছি, দিদি কী বল্‌চ।"
বাবা বল্‌লেন, "ওরা যে মানে না আমাদের মত।"
"তবু ওদের মতই যে আমাকে মান্‌তে হবে চিরদিন,"—
এই বলে সুনি সেফ্‌টিপিন ভরে রাখ্‌ল লেফাফায়।
দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর, কঠিন ওর মুখের ভাব,
সঙ্কল্প অবিচলিত।
বাবা বল্‌লেন, "অনিলের বাপ জাত মানে,
সে কি রাজি হবে।"
সগর্ব্বে বলে উঠল সুনৃতা,—
"চেনো না তুমি অনিল বাবুকে,
তাঁর জোর আছে পৌরুষের, তাঁর মত তাঁর নিজের।"
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাবা চলে গেলেন ঘর থেকে,
শমিতা উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে,
বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা।
সকাল থেকে খাওয়া নেই সুনৃতার,
শমিতা একবার এসেছিল ডাকতে,
ও বল্‌লে, খাবে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে।
মা-মরা মেয়ে, বাপের আদুরে,
মিনতি করতে আসছিলেন তিনি,
শনিতা পথ আগ্‌লিয়ে বল্‌লে,
"কখ্‌খনো যেতে পারবে না, বাবা,
ও না খায় তো নেই খেলো।"

জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখলে সুনৃতা রাস্তার দিকে.
এসেচে অনুদের গাড়ি।
তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়িয়ে
ব্রোচটা লাগাচ্চে যখন কাঁধে,
শমি এসে বল্‌লে, "এই নাও তাদের চিঠি।"
বলে ফেলে দিলে ছুঁড়ে ওর কোলে।
সুনৃতা পড়লে চিঠিখানা,
মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাসে,
বসে পড়ল তোরঙ্গের উপর।
চিঠিতে আছে—
"বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে,
হোলো না কিছুতেই,—
কাজেই——।"

বাজ্‌ল একটা।

সুনি চুপ করে বসে, চোখে জল নেই।

রামচরিত বল্‌লে এসে,

"মোটর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ।"

সুনি বল্‌লে, "যেতে বলে দে।"

কুকুরটা কাছে এসে বসে রইল চুপ করে।

বাবা বুঝলেন,

প্রশ্ন করলেন না,

বল্‌লেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে,

"চল্‌, সুনি, হোসেঙ্গাবাদে, তোর মামার ওখানে।"

কাল বিয়ের দিন।

অনিল জিদ করেছিল হবে না বিয়ে।

মা ব্যথিত হয়ে বলেছিল, "থাক্‌ না।"

বাপ বল্‌লে, "পাগল না কি।"

ইলেক্‌ট্রিক বাতির মালা খাটানো হচ্চে বাড়িতে,

সমস্তদিন বাজচে সানাই।

হুহু করে উঠচে অনিলের মনটা।

তখন সন্ধ্যা সাতটা।

সুনিদের বৌবাজারের বাড়ির একতলায়

ডাবা হুঁকো বাঁ হাতে ধরে তামাক খাচ্চে

কৈলেস সরকার,

আর তালপাতার পাখায় বাতাস চল্‌চে ডান হাতে ;

বেহারাকে ডেকেচে পা টিপে দেবে।

কালি-মাখা ময়লা জাজিমে কাগজপত্র রাশ করা।
জ্বলচে একটা কেরোসিন লণ্ঠন।
হঠাৎ অনিল এসে উপস্থিত।
কৈলেস শশব্যস্ত উঠে দাঁড়াল
শিথিল কাছা কোঁচা সামলিয়ে।
অনিল বল্‌লে
"পার্ব্বণীটা ভুলেছিলেম গোলেমালে,
তাই এসেচি দিতে।"
তার পরে বাধো বাধো গলায় বল্‌লে
"অমনি দেখে যাব তোমাদের সুনিদিদির ঘরটা।"
গেল ঘরে।
খাটের উপর রইল বসে মাথায় হাত দিয়ে।
কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ,
মূর্চ্ছিতের নিঃশ্বাসের মতো।
সে গন্ধ চুলের, না শুক্‌নো ফুলের,
না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির,
বিছানায়, চৌকিতে, পর্দ্দায়।
সিগারেট ধরিয়ে টানল কিছুক্ষণ,
ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলার বাইরে।
টেবিলের নীচে থেকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটা
নিল কোলে তুলে।
ধক্‌ করে উঠল বুকের মধ্যে;
দেখলে, ঝুড়ি-ভরা রাশি রাশি ছেঁড়া চিঠি,
ফিকে নীল রঙের কাগজে
অনিলেরই হাতে লেখা।
তার সঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো ছেঁড়া একটা ফোটোগ্রাফ।

আর ছিল বছর চার আগেকার
দুটি ফুল, লাল ফিতেয় বাঁধা
মেডেন্‌ হেয়ার পাতার সঙ্গে,
শুক্‌নো প্যান্‌সি আর ভায়োলেট।

২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯

কীটের সংসার

একদিকে কামিনীর ডালে
মাকড়্যা শিশিরের ঝালর দুলিয়েচে,
আর একদিকে বাগানে রাস্তার ধারে
লাল মাটির কণা-ছড়ানো
পিঁপ্‌ড়ের বাসা।
যাই আসি, তারি মাঝখান দিয়ে
সকালে বিকালে।
আনমনে দেখি, শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরেচে
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।
বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসারটুকু
দেখ্‌তে ছোটো, তবু ছোটো তো নয়।
তেমনি ঐ কীটের সংসার।

ভালো করে চোখে পড়ে না,
তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে ওরা।
কত যুগ থেকে অনেক ভাবনা ওদের,
অনেক সমস্যা, অনেক প্রয়োজন,—
অনেক দীর্ঘ ইতিহাস।
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত
চলেচে প্রাণশক্তির দুর্ব্বার আগ্রহ।
মাঝখান দিয়ে যাঁই আসি,
শব্দ শুনিনে ওদের চির-প্রবাহিত
চৈতন্যধারার,
ওদের ক্ষুধা পিপাসা জন্মমৃত্যুর।
গুন গুন সুরে আধখানা গানের
জোড় মেলাতে খুঁজে বেড়াই
বাকি আধখানা পদ,
এই অকারণ অদ্ভুত খোঁজের কোনো অর্থ নেই
ঐ মাকড়ষার বিশ্বচরাচরে,
ঐ পিঁপ্‌ড়ে সমাজে।
ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠ্‌চে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সঙ্গীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা।

আমি মানুষ,
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতুতে
আমার বাধা যায় খুলে খুলে।

কিন্তু ঐ মাকড়ষার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,—
ঐ পিঁপ্ড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।
ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে
আমি যাই সকালে বিকালে,
দেখি, শিউলি গাছে কুঁড়ি ধরচে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে॥

২৪ ভাদ্র ১৩৩৯

ক্যামেলিয়া

নাম তার কমলা।
দেখেচি তার খাতার উপরে লেখা,
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।
মুখের একপাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।
কোলে তার ছিল বই আর খাতা।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হোলো না।

এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই,—
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না,
প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরবার সময়ের সঙ্গে,
প্রায়ই হয় দেখা।
মনে মনে ভাবি আর কোনো সম্বন্ধ না থাক্
ও তো আমার সহযাত্রিণী।
নির্ম্মল বুদ্ধির চেহারা
ঝক্‌ঝক্ করচে যেন!
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসঙ্কোচ।
মনে ভাবি একটা কোনো সঙ্কট দেখা দেয় না কেন
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি,—
রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত,
কোনো একজন গুণ্ডার সর্দ্দার।
এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।
কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে,
না সেখানে হাঙর কুমীরের নিমন্ত্রণ, না রাজহাঁসের।

একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড়,
কমলার পাশে বসেচে একজন আধা-ইংরেজ।
ইচ্ছে করছিল অকারণে টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে।
ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে।
কোনো ছুতো পাইনে, হাত নিষ্‌পিষ্ করে।

এমন সময় সে এক মোটা চুরট ধরিয়ে
টান্‌তে করলে সুরু।
কাছে এসে বল্‌লুম, ফেলো চুরট।
যেন পেলেই না শুন্‌তে,
ধোঁওয়া ওড়াতে লাগল বেশ ঘোরালো করে।
মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেম চুরট রাস্তায়।
হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকালো কটমট করে,
আর কিছু বল্‌লে না, এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
আমার নাম আছে ফুটবল খেলায়,
বেশ একটু চওড়া গোছের নাম।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ,
বই খুলে মাথা নীচু করে ভান করলে পড়বার।
হাত কাঁপতে লাগল,
কটাক্ষেও তাকালে না বীরপুরুষের দিকে।
আপিসের বাবুরা বল্‌লে, বেশ করেচেন মশায়।
একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায়,
একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে।
পরদিন তাকে দেখলুম না,
তার পরদিনও না,
তৃতীয় দিনে দেখি
একটা ঠেলাগাড়িতে চলেচে কলেজে।
বুঝলুম, ভুল করেচি গোঁয়ারের মতো।
ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে,
আমাকে কোনো দরকারই ছিল না।

আবার বল্‌লুম মনে মনে,
ভাগ্যটা ঘোলাজলের ডোবা,—
বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলি আজ আওয়াজ করচে,
ঠাট্টার মতো।
ঠিক করলুম ভুল শোধরাতে হবে।

খবর পেয়েচি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জ্জিলিঙে।
সে-বার আমারও হাওয়া বদ্‌লাবার জরুরী দরকার।
ওদের ছোট্ট বাসা, নাম দিয়েচে মতিয়া,—
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে,
গাছের আড়ালে,
সামনে বরফের পাহাড়।
শোনা গেল আসবে না এবার।
ফিরব মনে করচি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহন লাল,—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চষমা,
দুর্ব্বল পাকযন্ত্র দার্জ্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।
সে বল্‌লে, "তনুকা আমার বোন,
কিছুতে ছাড়বে না, তোমার সঙ্গে দেখা না করে।"
মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু,—
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক, আহারে ততটা নয়।
ফুটবলের সর্দ্দারের পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি,—
মনে করলে, আলাপ করতে এসেচি সে আমার দুর্লভ দয়া।
হায়রে ভাগ্যের খেলা।

যেদিন নেমে আসব তার দুদিন আগে তনুকা বল্‌লে,
"একটি জিনিষ দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা,—
একটি ফুলের গাছ।"
এ এক উৎপাত। চুপ করে রইলেম।
তনুকা বল্‌লে, "দামী দুর্লভ গাছ,
এ দেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে।"
জিগেস কর্‌লেম, "নামটা কী?"
সে বল্‌লে "ক্যামেলিয়া।"
চমক লাগ্‌ল—
আর একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে।
হেসে বল্‌লেম, "ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না।"
তনুকা কী বুঝলে জানিনে হঠাৎ লজ্জা পেলে,
খুসিও হোলো।

চল্‌লেম টব সুদ্ধ গাছ নিয়ে।
দেখা গেল, পার্শ্ববর্ত্তিনী হিসাবে সহযাত্রিণীটি সহজ নয়।
একটা দো-কাম্‌রা গাড়িতে
টবটাকে লুকোলেম নাবার ঘরে।
থাক্‌ এই ভ্রমণবৃত্তান্ত,
বাদ দেওয়া যাক্‌ আরো মাস কয়েকের তুচ্ছতা।

পূজোর ছুটিতে প্রহসনের যবনিকা উঠল
সাঁওতাল পরগণায়।
জায়গাটা ছোটো। নাম বল্‌তে চাইনে,—
বায়ু বদলের বায়ু-গ্রস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।

কমলার মামা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়র।
এইখানে বাসা বেঁধেচেন
শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালীদের পাড়ায়।
সেখানে নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেচে বালির মধ্যে দিয়ে,—
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেচে,
মহিষ চরচে হর্ত্তকি গাছের তলায়,—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।
বাসা বাড়ি কোথাও নেই,—
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া।

কমলা এসেচে মাকে নিয়ে।
রোদ ওঠবার আগে
হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শাল বাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি-হাতে।
মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,—
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।
অল্পজল নদী পায়ে হেঁটে
পেরিয়ে যায় ওপারে,
সেখানে সিসু গাছের তলায় বই পড়ে।
আর আমাকে সে যে চিনেচে
তা জান্‌লেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই

একদিন দেখি, নদীর ধারে বালির উপর চড়িভাতি করচে এরা।
ইচ্ছে হোলো গিয়ে বলি, আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই।
আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে—
পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে,
আর তা ছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে
একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না।

দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক,—
শর্ট্-পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা,—
কমলার পাশে পা ছড়িয়ে
হাভানা চুরট খাচ্চে।
আর কমলা অন্যমনে টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌চে
একটা শ্বেতজবার পাপড়ি।
পাশে পড়ে আছে
বিলিতি মাসিক পত্র।

মুহূর্ত্তে বুঝলেম এই সাঁওতাল পরগণার নির্জ্জন কোণে
আমি অসহ্য অতিরিক্ত,—ধরবে না কোথাও।
তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিন কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।
সমস্তদিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল
আর দেখি কুঁড়ি এগোলো কত দূর।

সময় হয়েচে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেচি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব
শালপাতার পাত্রে।
তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়চি ডিটেক্‌টিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টিসুরে আওয়াজ এল, "বাবু ডেকেছিস্ কেনে "
বেরিয়ে এসে দেখি, ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেচে।
সে আবার জিগেস করলে, "ডেকেচিস কেনে ?"
আমি বল্‌লেম, "এই জন্মেই।"
তারপরে ফিরে এলেম কলকাতায়।

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৯

শালিখ

শালিখটার কী হোলো তাই ভাবি।
একলা কেন থাকে দলছাড়া।
প্রথম দিন দেখেছিলেম শিমুল গাছের তলায়,
আমার বাগানে,
মনে হোলো একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।
তারপরে ঐ রোজ সকালে দেখি,—
সঙ্গীহারা, বেড়ায় পোকা শিকার করে।

উঠে আসে আমার বারান্দায়
নেচে নেচে করে সে পায়চারি,
আমার পরে একটুকু নেই ভয়।
কেন এমন দশা।
সমাজের কোন্ শাসনে নির্ব্বাসনের পালা,
দলের কোন্ অবিচারে
জাগল অভিমান।
কিছু দূরেই শালিখগুলো
করচে বকাবকি,
ঘাসে ঘাসে তাদের লাফালাফি,
উড়ে বেড়ায় শিরীষ গাছের ডালে ডালে,
ওর দেখি তো খেয়াল কিছুই নেই।
জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েচে
সেই কথাটাই ভাবি।
সকাল বেলার রোদে যেন সহজ মনে
আহার খুঁটে খুঁটে
ঝরে-পড়া পাতার উপর
লাফিয়ে বেড়ায় সারা বেলা।
কারো উপর নালিশ কিছু আছে
মনে হয় না একটুও তা।
বৈরাগ্যের গর্ব্ব তো নেই ওর চলনে,
কিম্বা দুটো আগুন-জ্বলা চোখ।

কিন্তু ওকে দেখিনি তো সন্ধ্যেবেলায়—
একলা যখন যায় বাসাতে ডালের কোণে

ঝিল্লি যখন ঝিঁ ঝিঁ করে অন্ধকারে,
হাওয়ায় আসে বাঁশের পাতার ঝর্‌ঝরানি।
গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে
ঘুম-ভাঙানো
সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা॥

২১ ভাদ্র, ১৩৩৯

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,—
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
"বাসি ফুলের মালা।"—
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি,
দেখ্‌লেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।

তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও,
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন ক-জন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচাবয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো।
এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করব-যে সাহস হয় না,—
না করব-যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।

আর তারা কি সবাই অসামান্য,
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর তারা সবাই কি আবিষ্কার করেচে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেচে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালী কবির কবিতা ক-লাইন দিয়েচে তুলে,
সেই যেখানে উর্ব্বশী উঠ্চে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির পরে বসল পাশাপাশি,—
সামনে দুলচে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্ম্মল সূর্য্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বল্‌লে,
"এই সেদিন তুমি এসেচ, দুদিন পরে যাবে চলে,
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে,—
দুর্লভ মূল্যহীন।"
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গী।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেচে
"কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার,—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়?"
বুঝতেই পারচ,
একটা তুলনার সঙ্কেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো

আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পূরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো না হয় তাই হোলো,
না হয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।
পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েচি আমার কপাল ভেঙেচে,
হার হয়েচে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুল চন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই ;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসী জর্ম্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

কী করে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখ না কেন নরেশকে সাতবছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকা-মণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম, এ,
কলকাতা বিশ্বালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম, তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ঐখানেই যদি থামো
তোমার সাহিত্য-সম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্বান যারা বীর,
যারা কবি যারা শিল্পী যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে,
শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।

ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী,
আছে ইংরেজ, জর্ম্মান, ফরাসী।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক্ না,—
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক্ সেখানে বর্ষণ হচ্চে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেচে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করচে কানাকানি,
সবাই বলচে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেচে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্ত্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বল্‌তে হোলো নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটেনি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।
আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটে শাকটি মুড়োলো,
স্বপ্ন আমার ফুরোলো।
হায়রে সামান্য মেয়ে
বিধাতার শক্তির অপব্যয়॥

২৯ শ্রাবণ, ১৩৩৯

একজন লোক

আধবুড়ো হিন্দুস্থানী,
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ,
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেচে সহরের দিকে।
ভাদ্র মাসের সকাল বেলা,
পাৎলা মেঘের ঝাপ্‌সা রোদ্দুর ;
কাল গিয়েচে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দো-মনা করে বইচে আমলকির কচি ডালে।

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষ-রেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়া-ছবির চলাচল।
ওকে শুধু জান্‌লুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায়
একজন লোক।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াষার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি—একজন লোক।

তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায় ;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে,
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে ;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলীদের কাছে,—
কোনোখানেই নেই
আমি—একজন লোক।

১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা তার ভিৎপত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে,—
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে।

ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া,
এ দেবতা কিরাতের।
একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ,—
দেউলের আঙিনা পূজারীদের রক্তে গেল ভেসে,
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে, নতুন পূজাবিধির আড়ালে,—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তি-ধারার স্রোত গেল ফিরে।
কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশ-পথ লুপ্ত।

কিরাত থাকে সমাজের বাইরে,
নদীর পূর্ব্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত, আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী করে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রূপোর ফুল তোলা যায়,—
কৃষ্ণশিলায় মূর্ত্তি গড়বার ছন্দটা কী।
রাজশাসন তার নয়, অস্ত্র তার নিয়েচে কেড়ে,
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জ্জিত,
বঞ্চিত সে পুঁথির বিদ্যায়।
ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিম দিগন্তে যায় দেখা,
চিন্‌তে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প,
বহু দূরের থেকে প্রণাম করে।

কার্ত্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।
মঞ্চের উপরে বাজচে বাঁশি মৃদঙ্গ করতাল,
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত,
মাঝে মাঝে উঠেচে ধ্বজা।

পথের দুইধারে ব্যাপারীদের পসরা,—
তামার পাত্র, রূপোর অলঙ্কার, দেবমূর্ত্তির পট, রেশমের কাপড়,
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি ;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল মালা ধূপ বাতি, ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।
বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্চে বাজি,
কথক পড়চে রামায়ণ কথা।
উজ্জ্বলবেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে ;
রাজ-অমাত্য হাতীর উপর হাওদায়,
সম্মুখে বেজে চলেচে শিঙা।
কিংখাবে ঢাকা পাল্‌কীতে ধনীঘরের গৃহিণী,
আগে পিছে কিঙ্করের দল।
সন্ন্যাসীর ভিড় পঞ্চবটের তলায়,
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা,
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়
ফল দুধ মিষ্টান্ন, ঘি, আতপ তণ্ডুল।
থেকে থেকে আকাশে উঠ্‌চে চীৎকারধ্বনি,
জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়।
কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা,
স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে।
তাঁর আগমন-পথের দুইধারে
সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,
মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব।
আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধূলায় সেচন করচে গন্ধবারি।

শুক্ল ত্রয়োদশীর রাত।
মন্দিরে প্রথম প্রহরের শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী পটহ থেমেচে।

আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা,—
যেন মূর্চ্ছার ঘোর লাগ্‌ল।
বাতাস রুদ্ধ,—
ধোঁয়া জমে আছে আকাশে,
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট।
কুকুর অকারণে আর্ত্তনাদ করচে,
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠ্‌চে ডেকে
কোন্‌ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে।
হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে—
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু গুরু গুরু গুরু।
মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবল শব্দে।
হাতী বাঁধা ছিল
তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জ্জন করতে করতে
ছুটল চারদিকে
যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মেঘ;
তুফান উঠ্‌ল মাটিতে,
ছুট্‌ল উট মহিষ গোরু ছাগল ভেড়া
ঊর্দ্ধশ্বাসে, পালে পালে।
হাজার হাজার দিশাহারা লোক
আর্ত্তস্বরে ছুটে বেড়ায়,
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্ম-পরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ'লে।
মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁওয়া, ওঠে গরমজল,—
ভীম সরোবরের দিঘি বালির নীচে গেল শুষে।

মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা দুল্‌তে দুল্‌তে
বাজতে লাগল ঢং ঢং।
আচম্‌কা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে।
পৃথিবী যখন স্তব্ধ হোলো
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেচে পশ্চিমের দিকে।
আকাশে উঠচে জ্বলে-ওঠা কানাৎগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েচে।

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্বিদিক যখন শোকার্ত্ত,—
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়ালো,
পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত্তপণ্ডিত এল।
দেখলে, বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ।
দেবতার বেদীর উপরের ছাদ পড়েচে ভেঙে।
পণ্ডিত বল্‌লে, সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্ব্বেই
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্ত্তিকে।
রাজা বল্‌লেন, “সংস্কার করো।”
মন্ত্রী বল্‌লেন, “ঐ কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ।
ওদের দৃষ্টি-কলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে,
কী হবে মন্দির-সংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গ-মহিমা।”
কিরাত-দলপতি মাধবকে রাজা আন্‌লেন ডেকে।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্ম্মল সাদা চাদর জড়ানো,—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি-পর্য্যন্ত অনাবৃত,—
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ,
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দফুল,
প্রণাম করলে, স্পর্শ বাঁচিয়ে।

রাজা বল্‌লেন, "তোমরা না হলে দেবালয় সংস্কার হয় না।"
"আমাদের পরে দেবতার ঐ কৃপা,"
এই বলে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে।
নৃপতি নৃসিংহরায় বল্‌লেন, "চোখ বেঁধে কাজ করা চাই,
দেবমূর্ত্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে ?"
মাধব বল্‌লে, "অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্য্যামী।
যতক্ষণ কাজ চল্‌বে, চোখ খুলব না।"

বাহিরে কাজ করে কিরাতের দল,
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না,
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চল্‌তে থাকে।
মন্ত্রী এসে বলে, "ত্বরা করো, ত্বরা করো,
তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।"
মাধব জোড়হাতে বলে, "যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ্য।"

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ এল আবার।
অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।
কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।
পণ্ডিত এসে বল্‌লে, "একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।
কাজ কি শেষ হবে তার পূর্ব্বে।"
মাধব প্রণাম করে বল্‌লে, "আমি কে, যে, উত্তর দেব ;

কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে,
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘট্‌বে।”
ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোলো,
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে
মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য্য অস্ত গেল, পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে,
“যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে
মাধবের কাজ শেষ হোলো আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।”

প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেল্‌লে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েচে একাদশী চাঁদের পূর্ণ আলো
দেবমূর্ত্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্ত্তে ছিন্ন হোলো সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম ॥
২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯

অস্থানে

একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধু-মঞ্জরী
দশটি বছর কাটিয়েচে গায়ে গায়ে,
রোজ সকালে সূর্য্য আলোর ভোজে
পাতাগুলি মেলে বলেচে
এই তো এসেচি।
অধিকারের দ্বন্দ্ব ছিল ডালে ডালে দুই শরিকে,
তবু তাদের প্রাণের আনন্দে
রেশারেশির দাগ পড়েনি কিছু।

কখন্ যে কোন্ কুলগ্নে ঐ
সংশয়হীন অবোধ চামেলি
কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল
বিজ্‌লি বাতির লোহার তারে তারে,
বুঝতে পারেনি যে ওরা জাত আলাদা।—
শ্রাবণ মাসের অবসানে আকাশ কোণে
সাদা মেঘের গুচ্ছগুলি
নেমে নেমে পড়েছিল শালের বনে,
সেই সময়ে সোনায় রাঙা স্বচ্ছ সকালে
চামেলি মেতেছিল অজস্র ফুলের গৌরবে
কোথাও কিছু বিরোধ ছিল না;
মৌমাছিদের আনাগোনায়
উঠত কেঁপে শিউলিতলার ছায়া।

ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে
বেলা হোত আলস্যে শিথিল।

সেই ভরা শরতের দিনে সূর্য্য-ডোবার সময়
মেঘে মেঘে লাগ্‌ল যখন নানা রঙের খেয়াল,
সেই বেলাতে কখন এল
বিজ্‌লি বাতির অনুচরের দল।
চোখ রাঙালো চামেলিটার স্পর্দ্ধা দেখে,—
শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় প্রয়োজনের পরে
নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার
হাত বাড়ালো কেন?
তীক্ষ্ণ কুটিল আঁকৃষি দিয়ে
টেনে টেনে ছিনিয়ে ছিঁড়ে নিল
কচি কচি ডালগুলি সব ফুলে-ভরা।
এতদিনে বুঝ্‌ল হঠাৎ অবোধ চামেলিটা
মৃত্যু-আঘাত বক্ষে নিয়ে,
বিজ্‌লি বাতির তারগুলো ঐ জাত আলাদা॥

২৩ ভাদ্র, ১৩৩৯

ঘরছাড়া

এলো সে জর্ম্মনির থেকে
এই অচেনার মাঝখানে,
ঝড়ের মুখে নৌকো নোঙর-ছেঁড়া
ঠেকল এসে দেশান্তরে।

পকেটে নেই টাকা,
উদ্বেগ নেই মনে,
দিন চলে যায় দিনের কাজে
অল্প স্বল্প নিয়ে।
যেমন তেমন থাকে
অন্য দেশের সহজ চালে।
নেই ন্যূনতা, গুমর কিছুই নেই,
মাথা উঁচু
দ্রুত পায়ের চাল।
একটুও নেই অকিঞ্চনের অবসাদ।
দিনের প্রতি মুহূর্ত্তকে
জয় করে সে আপন জোরে,
পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যায় সে চলে,
চায় না পিছন ফিরে,
রাখে না তার এক কণাও বাকি।
খেলা ধূলা হাসি গল্প যা হয় যেখানে
তারি মধ্যে জায়গা সে নেয়
সহজ মানুষ।
কোথাও কিছু ঠেকে না তার
একটুকুও অনভ্যাসের বাধা।
একলা বটে তবুও তো
একলা সে নয়।
প্রবাসে তার দিনগুলো সব
হুহু করে কাটিয়ে দিচ্ছে হাল্‌কা মনে।
ওকে দেখে অবাক হয়ে থাকি,
সব মানুষের মধ্যে মানুষ

অভয় অসঙ্কোচ,—
তার বাড়া ওর নেই তো পরিচয়।
দেশের মানুষ এসেচে তার
আরেক জনা।
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে সে
যা-খুসি তাই ছবি এঁকে এঁকে,
যেখানে তার খুসি।
সে ছবি কেউ দেখে কিম্বা নাই দেখে,—
ভালো বলে নাই বলে
খেয়াল কিছুই নেই।
দুইজনেতে পাশাপাশি
কাঁকর-ঢালা পথ দিয়ে ঐ
যাচ্চে চলে,
দুই টুক্‌রো শরৎকালের মেঘ।
নয় ওরা তো শিকড়-বাঁধা গাছের মতো,—
ওরা মানুষ,
ছুটি ওদের সকল দেশে সকল কালে,
কর্ম্ম ওদের সবখানে,
নিবাস ওদের সব মানুষের মাঝে।
মন যে ওদের স্রোতের মতো
সব কিছুরেই ভাসিয়ে চলে—
কোনোখানেই আট্‌কা পড়ে না সে।
সব মানুষের ভিতর দিয়ে
আনাগোনার বড়ো রাস্তা তৈরি হবে,
এরাই আছে সেই রাস্তার কাজে
এই যত সব ঘরছাড়াদের দল॥

১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

ছুটির আয়োজন

কাছে এল পূজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেচে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠচে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।

মাষ্টার মশায় পড়িয়ে চলেন
পাথুরে কয়লার আদিম কথা,—
ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়
ছবি দেখে আপন মনে,
কমল দিঘির ফাটল-ধরা ঘাট,
আর ভঞ্জদের পাঁচিল-ঘেঁষা
আতা গাছের ফলে-ভরা ডাল।
আর দেখে সে মনে মনে তিসির ক্ষেতে
গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়ে
রাস্তা গেছে এঁকে বেঁকে হাটের পাশে
নদীর ধারে।

কলেজের ইকনমিক্স্ ক্লাসে
খাতায় ফর্দ্দ নিচ্চে টুঁকে
চষমা চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্র—
হালের লেখা কোন্ উপন্যাস কিন্‌তে হবে,
ধারে মিল্‌বে কোন্ দোকানে
"মনে-রেখো" পাড়ের সাড়ি,
সোনায় জড়া শাঁখা,
দিল্লির কাজ-করা লাল মখমলের চটি।
আর চাই রেশমে বাঁধাই-করা
এন্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়চে না।

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চল্‌চে সরু মোটা গলায়—
এবার আবু পাহাড়, না মাতুরা
না ড্যালহৌসী কিম্বা পুরী,
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জ্জিলিঙ।

আর দেখচি সামনে দিয়ে
ষ্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
সহরের দাদন দেওয়া দড়ি-বাঁধা ছাগল ছানা
পাঁচটা ছ-টা ক'রে ;
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন ক'রে বুঝেচে তারা
এল তাদের পুজার ছুটির দিন॥

১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯

মৃত্যু

মরণের ছবি মনে আনি।
ভেবে দেখি শেষদিন ঠেকেচে শেষের শীর্ণক্ষণে।
আছে বলে যত কিছু
রয়েচে দেশেকালে,
যত বস্তু, যত জীব, যত ইচ্ছা, যত চেষ্টা,
যত আশা নৈরাশ্যের ঘাত প্রতিঘাত
দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, চিত্তে চিত্তে ;
যত গ্রহ নক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্ত্তন
মহাকাল সমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে,
সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এধারে।
এক পা তখনো আছে সে প্রান্তসীমায়,
অন্য পা আমার
বাড়িয়েচি রেখার ওধারে,
সেখানে অপেক্ষা করে অলক্ষিত ভবিষ্যৎ
লয়ে দিন রজনীর অন্তহীন অক্ষমালা
আলো অন্ধকারে গাঁথা।

অসীমের অসংখ্য যা কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে ;
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাত না নিখিল তরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হোতো
যদি হোতো মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ॥

২৬ ভাদ্র, ১৩৩৯

মানবপুত্র

মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহুত অনাহূতের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহু শত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্ত্ত্যধামে।
চেয়ে দেখলেন,

সেকালেও মানুষ ক্ষত বিক্ষত হোত যে সমস্ত পাপের মারে,—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,
বিদ্যুদ্বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্চে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানা ঘরে।

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হোলো,
ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠ্‌ল নরঘাতকের হাতে,
পূজারী তাতে লাগিয়েচে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন,—
বুঝলেন শেষ হয়নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্চে বিজ্ঞানশালায়,
বিঁধচে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্ম্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্ম্মমন্দিরের বেদীর সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকচে ঘাতক সৈন্যকে,
বলচে, "মারো, মারো।"
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠ্‌লেন ঊর্দ্ধে চেয়ে,
"হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।"

শ্রাবণ ১৩৩৯

শিশুতীর্থ

রাত কত হোলো?
উত্তর মেলেনা।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে,
পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলীতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেচে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্ত্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ:
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে;
ওকি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি,
ওকি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্ত্তিত আলোড়িত হতে থাকে,
ও কি বন্দী বন্যা-বারির গুহা-বিদারণের রলরোল?
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্র মন্ত্র উচ্চারণ?

ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়-নিনাদ ?
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদ-কলমুখর পঙ্কস্রোত ;
তাতে একত্রে মিলেচে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো,
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্চে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে নির্ব্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্ত্তস্বরে বিলাপ করে,
বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে,
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না॥

২

ঊর্দ্ধে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;—
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখী চিৎকার শব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্‌ ব'লে জেনো।
ওরা শোনেনা, বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে পশুই শাশ্বত ;
বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায়, বিলাপ ক'রে বলে, "ভাই তুমি কোথায় ?"
উত্তরে শুন্‌তে পায়, "আমি তোমার পাশেই।"

অন্ধকারে দেখ্‌তে পায় না, তর্ক করে, "এ বাণী ভয়ার্ত্তের মায়া-সৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।"
বলে, "মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে,
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসা-কণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে॥"

৩

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্ব্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠ্‌ল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্ম্মর বন পথে পথে হিল্লোলিত,
পাখী ডাক দিল শাখায়-শাখায়।
ভক্ত বল্‌লে, সময় এসেচে।
কিসের সময়?
যাত্রার।
ওরা বসে ভাব্‌লে।
অর্থ বুঝ্‌লে না, আপন আপন মনের মতো করে অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নাম্‌ল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠ্‌ল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে কানে বল্‌লে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত হয়ে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠ্‌ল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুল্‌লে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।

শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠ্‌ল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে,
সবাই বলে উঠ্‌ল, "ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।"

৪

যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্ব্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে।—
এল নীল নদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে ;
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতীতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্ম্মের পূজারী চল্‌ল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র পড়ে ;
রাজা চল্‌ল, অনুচরদের বর্ষা-ফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা পরে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছন-খচিত উজ্জ্বল বেশে ;—
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেচে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেচে সেই সঙ্গে, তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতি-প্রকট তাদের প্রসাধন।

চলেচে পঙ্গু খঞ্জ, অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্ম্মব্যবসায়ী,
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট করে কিছু বলে না,—কেবল নিজের লোভকে মহৎ নাম ও
বৃহৎ মূল্য দিয়ে ঐ শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শান্তিশঙ্কাহীন চৌর্য্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

৫

দয়াহীন দুর্গমপথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেচে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরা-জর্জ্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা,
আর যারা অর্দ্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়, পাছে বিলম্ব করে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।

দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
    অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সঙ্কেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
    আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হোতে থাকে।

৬

রাত হয়েচে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বস্‌ল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়,
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠ্‌ল মূর্চ্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বল্‌লে,
"মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেচ।"
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাক্‌ল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জ্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
                    হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠ্‌ল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্‌নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসচে।
বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।

মেয়েরা কাঁদচে, পুরুষেরা উত্যক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করচে, চুপ করো।
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জ্জন করে,
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়
এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হোলো,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ ;
সূর্য্যরশ্মির তর্জ্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌ল, পুরুষেরা মুখ ঢাক্‌ল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না ;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, "কে আমাদের পথ দেখাবে ?"
পূর্ব্ব দেশের বৃদ্ধ বল্‌লে,
"আমরা যাকে মেরেচি সেই দেখাবে।"
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বল্‌লে, "সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেচি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেচি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহা মৃত্যুঞ্জয়।"
সকলে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
"জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।"

৮

তরুণের দল ডাক দিল, "চলো যাত্রা করি,
প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে,"
হাজার কণ্ঠের ধ্বনি-নির্ঝরে ঘোষিত হোলো—
"আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।"
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক,
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেচে
সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে;
সে-যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েচে
এবং জীবনের সীমাকে করেচে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেচে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে, যেখানে শস্য হয়েচে সঞ্চিত,
সেই অনুর্ব্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল।
তারা চলেচে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেচে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্ত্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;
চলেচে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাট্‌ল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,

"ঐ কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণ-চূড়া ?"
সে বলে, "না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে
অস্তগামী সূর্য্যের বিলীয়মান আভা।"
তরুণ বলে "থেমো না, বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।"
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সঙ্গীতে বলে, "সাথী, অগ্রসর হও।"
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, "আর বিলম্ব নেই।"

৯

প্রত্যূষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠ্‌ল।
নক্ষত্রসঙ্কেতবিদ জ্যোতিষী বল্‌লে "বন্ধু আমরা এসেচি।"
পথের দুইধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান,—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্ত্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান।
কুমোরের চাকা ঘুরচে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনচে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেচে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভরে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ উচাটন মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি ?

জ্যোতিষী বললে, "নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না
তাদের সঙ্কেত এইখানেই এসে থেমেচে।"
এই বলে ভক্তি-নম্রশিরে
পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠ্‌চে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত-মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।
নিকটে তালি-কুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটীর
অনির্ব্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বল্‌চে,
"মাতা, দ্বার খোলো।"

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্ন প্রান্তে
তির্য্যক্‌ হয়ে পড়েচে।
সম্মিলিত জন-সংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুন্‌তে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, "মাতা, দ্বার খোলো।"
দ্বার খুলে গেল।

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্য্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝঙ্কার, গান উঠ্‌ল আকাশে,
"জয় হোক্‌ মানুষের, ঐ নব জাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী,
জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, "জয় হোক্ মানুষের,
ঐ নব জাতকের, ঐ চিরজীবিতের ॥"

শ্রাবণ, ১৩৩৮

শাপমোচন

গন্ধর্ব্ব সৌরসেন সুরলোকের সঙ্গীতসভায়
কলানায়কদের অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরু-শিখরে
সূর্য্য-প্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের মন ছিল উদাসী।
অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে,
উর্ব্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।
স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে
গন্ধর্ব্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল,
অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হোলো
গান্ধার রাজগৃহে।
মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল,
বল্‌লে, "বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না,
একই লোকে আমাদের গতি হোক,
একই দুঃখভোগ, একই অবমাননায়।"

শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন।
ইন্দ্র বল্‌লেন, "তথাস্তু, যাও মর্ত্ত্যে,
সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে।
সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।"

মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে—নাম নিল কমলিকা।
একদিন গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি।
সেই ছবি তার দিনের চিন্তা, তার রাত্রের স্বপ্নের পরে
আপন ভূমিকা রচনা করলে।
গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে।
বিবাহ-প্রস্তাব শুনে রাজা বল্‌লে,
"আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।"

ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।
রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায়
এসেচে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্কবিহারিণী বীণা।
স্তব্ধসঙ্গীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।
যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।
নির্ব্বাণ-দীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতিরাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।
কমলিকা বলে, "প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে
আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।"
রাজা বলে, "আমার গানেই তুমি আমাকে দেখ।"
অন্ধকারে বীণা বাজে।
অন্ধকারে গান্ধর্ব্বীকলার নৃত্যে
বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।

সেই নৃত্যকলা নির্ব্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেচে
তার মর্ত্ত্যদেহে।
নৃত্যের বেদনা রাণীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে,
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে
যখন শুকতারা পূর্ব্বগগনে,
কমলিকা তার সুগন্ধী এলোচুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে,
বল্‌লে, "আদেশ করো আজ ঊষার প্রথম আলোকে
তোমাকে প্রথম দেখব।"
রাজা বল্‌লে, "প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে
নষ্ট কোরো না এই মিনতি।"
মহিষী বল্‌লে, "প্রিয়-প্রসাদ থেকে
আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে।
অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।"
অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।
রাজা বল্‌লে "কাল চৈত্রসংক্রান্তি।
নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন।
প্রাসাদ-শিখর থেকে চেয়ে দেখো।"
মহিষীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল
বল্‌লে, "চিন্‌ব কী করে।"
রাজা বল্‌লে, "যেমন খুসি কল্পনা করে নিয়ো;
সেই কল্পনাই হবে সত্য।"

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন।
মহিষী বললে, "দেখলাম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরু-শ্রেণীতে
বসন্ত বাতাসের মত্ততা।
সকলেই সুন্দর।
যেন ওরা চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষের মানুষ।
কেবল একজন কুশ্রী কেন রস-ভঙ্গ করলে, ও যেন রাহুর অনুচর।
ওখানে কী গুণে সে পেল প্রবেশের অধিকার।"
রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল।
কিছু পরে বললে, "ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো
সুন্দরের আহ্বান।
কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্য্যরশ্মি
তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু,
মরু-নীরস কালো মর্ত্তের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা
যখন রূপ ধরে
তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব।
প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।"
"না, মহারাজ, না" বলে মহিষী দুইহাতে মুখ ঢাকলে।
রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁওয়া লাগল।
বললে, "যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভরে উঠত
তাকে ঘৃণা করে মনকে কেন পাথর করলে।"
"রস-বিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে"
এই বলে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল
রাজা তার হাত ধরলে,
বললে, "একদিন সইতে পারবে
আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে
কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।"

ভ্রূ-কুটিল করে মহিষী বল্‌লে,
"অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝিনে।
ঐ শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক,
অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি।
আজ সূর্য্যোদয়-মুহূর্ত্তে তোমারও প্রকাশ হবে
আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলাম।"
রাজা বল্‌লে, "তাই হোক্, ভীরুতা যাক্ কেটে।"
দেখা হোলো।
টলে উঠল যুগলের সংসার।
"কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা,"—
বল্‌তে বল্‌তে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।
গেল বহুদূরে,—
বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জ্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে।
কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।
রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধ-ঘুমে সে শুনতে পায়
এক বীণাধ্বনির আর্ত্তরাগিণী।
স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে,
মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।
রাতের পরে রাত গেল।
অন্ধকারে তরুতলে যে-মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না তাকে হৃদয়ে দেখা যায়,
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার মূর্ত্তি।
এ কী হোলো রাজমহিষীর।
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে।
মাটির প্রদীপ-শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল বুঝি।

রাত-জাগা পাখী নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে
হূহু করে উড়ে যায়,
তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখীর পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।
বীণায় বাজতে থাকে কেদারা, বেহাগ, বাজে কালাংড়া।
আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।
রাজমহিষী বিছানার পরে উঠে বসে।
স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ।
বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্য পথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে ? দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।
একদিন নিম ফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে
অনির্ব্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেচে।
মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ালো।
নীচে সেই ছায়ামূর্ত্তির নৃত্য, বিরহের সেই ঊর্ম্মি-দোলা।
মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত।
ঝিল্লীঝঙ্কৃত রাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে।
অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইচে।
সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে।
কখন নাচ আরম্ভ হোলো সে জানে না।
এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।
গেল আরো দুই রাত।
অভিসারের পথ একান্তই শেষ হয়ে আসচে এই জানলারই কাছে।
সেদিন বীণায় পরজের বিহ্বল মীড়।
কমলিকা আপন মনে নীরবে বলচে,
ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না।
আমার আর দেরি নেই।

কিন্তু যাবে কার কাছে।
চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো।
কেমন করে হবে।
দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠিয়ে দিলে সাতসমুদ্রপারে, রূপকথার দেশে।
সেখানকার পথ কোন্ দিকে ?
আরো এক রাত যায়।
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেচে অমাবস্যার তলায়।
আঁধারের ডাক কী গভীর।
পথ-না-জানা যত সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।
সেই অস্ফুট আকাশ-বাণীর সঙ্গে মিলে ঐ যে বাজে বীণায় কানাড়া।
রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ আমি যাব।
আমার চোখকে আমি আর ভয় করিনে।"
পথের শুক্‌নো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে
সে গেল পুরাতন অশথ গাছের তলায়।
বীণা থামল।
মহিষী থমকে দাঁড়ালো।
রাজা বল্‌লে, "ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।"
তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর গুরু গুরু ধ্বনির মতো।
"আমার কিছু ভয় নেই, তোমারি জয় হোলো।"
এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে।
ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠ্‌ল, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার॥"

পৌষ ১৩৩৮

ছুটি

দাও না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন্ খানে।
যেখানে ঐ শিরীষবনের গন্ধপথে
মৌমাছিদের কাঁপচে ডানা সারাবেলা।
যেখানেতে মেঘ-ভাসা ঐ সুদূরতা ;
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে
সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে ;
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে,
শূন্য ঘরে অতীত স্মৃতি গুন্‌গুনিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদল রাতে।
যেখানে এই মন
গোরু-চরা মাঠের মধ্যে স্তব্ধ বটের মতো
গাঁয়ে-চলা পথের পাশে।
কেউবা এসে, প্রহরখানেক
বসে তলায়,
পা ছড়িয়ে কেউবা বাজায় বাঁশি,
নব বধূর পাল্কীখানা নামিয়ে রাখে
ক্লান্ত দুই পহরে ;
কৃষ্ণ একাদশীর রাতে
ছায়ার সঙ্গে ঝিল্লিরবে জড়িয়ে পড়ে
চাঁদের শীর্ণ আলো।

যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে ;
ধরে-রাখার নাই কোনো আগ্রহ,
দূরে-রাখার নাই তো অভিমান।
রাতের তারা স্বপ্ন-প্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে
যায় চলে তার দেয় না ঠিকানা ॥

৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯

গানের বাসা

তোমরা দুটি পাখী,
মিলন বেলায় গান কেন আজ
মুখে মুখে নীরব হোলো।
আতসবাজির বক্ষ থেকে
চতুর্দ্দিকে স্ফুলিঙ্গ সব ছিটকে পড়ে,
তেমনি তোমাদের
বিরহতাপ ছড়িয়ে গিয়েছিল
সারারাত্রি সুরে সুরে
বনের থেকে বনে।
গানের মূর্ত্তি নিয়ে তারা পড়ল না তো ধরা—
বাতাস তাদের মিলিয়ে দিল
দিগন্তরের অরণ্যচ্ছায়ায়।

আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিৎ গড়ি তার গানের সুরে ;
খুঁজে আনি জরাবিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে।
বিশ্বজনের সবার জন্যে সে গান থাকে
সব প্রেমিকের প্রাণের আসন মেলে দিয়ে।
বিপুল হয়ে উঠেচে সে
দেশে দেশে কালে কালে।
মাটির মধ্যখানে থেকে
মাটিকে সে অনেক দূরে ছাড়িয়ে তোলে মাথা
কল্প স্বর্গলোকে।

সহজ ছন্দে যায় আনন্দে জীবন তোমাদের
উধাও পাখার নাচের তালে।
দুরু দুরু কোমল বুকের প্রেমের বাসা
আপনি আছে বাঁধা
পাখীর ভুবনে।
প্রাণের রসে শ্যামল মধুর,
মুখরিত গুঞ্জনে মর্ম্মরে,
ঝলকিত চিকন পাতার দোলনে কম্পনে ;
পুলকিত ফুলের উল্লাসে ;
নব নব ঋতুর মায়া-তুলি
সাজায় তারে নবীন রঙে ;
মনে-রাখা ভুলে-যাওয়া
যেন দুটি প্রজাপতির মতো

সেই নিভৃতে অনায়াসে হাল্‌কা পাখায়
আলোছায়ার সঙ্গে বেড়ায় খেলে।

আমরা কেবল বানিয়ে তুলি
আপন ব্যথার রঙে রসে
ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই,
বেড়া দিয়ে আগ্‌লে রাখি
ভালোবাসার জন্যে দূরের বাসা।
সেই আমাদের গান॥

৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯

পয়লা আশ্বিন

হিমের শিহর লেগেচে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।
শিউলিফুলের নিঃশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পূজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

পূব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে,
বুকের মধ্যে শব্দ যে তার
রক্তে লাগায় দোলা।
কত যুগের কত দেশের বিশ্ববিজয়ী
মৃত্যুপথে ছুটেছিল
অমর প্রাণের অসাধ্য সন্ধানে।
তাদেরি সেই বিজয়শঙ্খ
রেখে গেছে অরব ধ্বনি
শিশির-ধোওয়া রোদে।
বাজ্‌ল রে আজ বাজ্‌ল রে তার
ঘর-ছাড়ানো ডাক
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

ধনের বোঝা, খ্যাতির বোঝা, দুর্ভাবনার বোঝা
ধূলোয় ফেলে দিয়ে
নিরুদ্বেগে চলেছিল জটিল সঙ্কটে।
ললাট তাদের লক্ষ্য করে
পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল
দুর্জ্জনেরা মলিন হাতে ;
নেমেছিল উল্কা আকাশ থেকে,
পায়ের তলায় নীরস নিঠুর পথ
তুলেছিল গুপ্ত ক্ষুদ্র কুটিল কাঁটা।
পায়নি আরাম, পায়নি বিরাম,
চায়নি পিছন ফিরে ;
তাদেরি সেই শুভ্রকেতনগুলি
ঐ উড়েচে শরৎ প্রাতের মেঘে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন,
গান জাগিয়ে চলো সমুখপথে,
যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নব সূর্য্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানি-ভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী,
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্ম্মল এই শরৎ রৌদ্রালোকে,
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

১ আশ্বিন, ১৩৩৯